The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp.1 - 16)
Published in November 2024

নীতিশিক্ষার গুরুত্বঃ প্রসঙ্গ ব্যক্তি ও সমাজজীবন

ড. এফ. এম. এনায়েত হোসেন *

প্রতিপাদ্যসারঃ সাম্প্রতিককালে নীতিবিদ্যার আলোচনার পরিধি কেবল তাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক নীতিবিদদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রবিশেষ একাডেমিক পরিসরের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যবহারিক জীবনে তা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার, রাজনীতি, জনজীবন- এসবের মতো প্রকৃতিও নিয়তই পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে। মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা পৃথিবীকে আরও অনেক সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তুলছে। মানুষের জীবনে আছে অন্তহীন সম্ভাবনা, সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথও আছে অধিক প্রসারিত। সে পথে চলতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বান্তকরণে নীতিশিক্ষার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো উন্নততর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করা এবং তার জন্য যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলন (Logical and Intellectual movement) গড়ে তোলা। ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে দুর্নীতি সমস্যার সমাধান করে সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মধ্যে মানুষ কীভাবে অধিকতর ভালো জীবন যাপন করতে পারে, তা উদঘাটন করাই একজন নীতিবান ব্যক্তি এমনকি শাসকের মূখ্য কাজ। এছাড়াও, জীবিকা অর্জন ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক সমাধানও নীতিশিক্ষার অওতাভুক্ত। ন্যায়নীতি অবলম্বন করে জীবনযাপনে ব্যক্তি মানুষ সময়ে সময়ে ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু তারপরও ন্যায়নীতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রয়োজনীয়তা নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে আরও অধিক বাড়িয়ে তুলছে। জীবনযাত্রার ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত করার চেষ্টা করে তারই মধ্যে নিহিত থাকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; যা মানুষকে সৎ, আদর্শ ও নীতিবান হতে সহায়তা করে (রহমান ৯-১৩)। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের সুন্দর হবার ও সুন্দর করার, সমৃদ্ধ হবার ও সমৃদ্ধ করার এবং উন্নত হবার ও উন্নত করার যে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা তাই হলো ব্যক্তির জীবনদর্শন। আর, এর মধ্য দিয়ে কীভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তঃইন্দ্রিয়সহ পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার, রূপান্তর ও নবজন্ম ঘটে তা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.১ ভূমিকাঃ

ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের সাথে সাথে নৈতিক মান উন্নয়ন করাও একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে বিবেচনায় নেয়া শিক্ষাবিদদের একান্ত কর্তব্য। মানুষ তার নিজস্ব মানবপ্রকৃতি দিয়ে কাজ করে। এখানে মানব প্রকৃতি বলতে মানুষের জীবতাত্ত্বিক দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত। অথচ, এই প্রবৃত্তিকে বিদ্যা-শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করা সম্ভব। এভাবে পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই মানুষ নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে অস্থিতিশীল বিশ্বের সকল মানুষ চায় স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, শান্তি, সমস্যা থেকে মুক্তি, চায় সম্পদের সমবন্টন, সুবিচার ও আইনের শাসন। মানুষ আজ এমন একটি বিশ্ব চায় যেখানে থাকবে উন্নয়ন, কল্যাণ, প্রেম,

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মানবতা, শান্তি, সৌন্দর্য ও আশীর্বাদ। দেশের মানুষকে আজ তাই নীতিশিক্ষার মৌলিক আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আজকের দিনে মানুষ তাই অনুধাবন করছে যে, নীতিভিত্তিক শিক্ষাদর্শনই দিতে পারে জাতির কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণ ব্যক্তির জীবন গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, শুধু প্রচলিত শিক্ষা পরিপূর্ণ মানুষ হবার জন্য যথোপযুক্ত নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন অধিক নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ। বর্তমান সমাজব্যবস্থা অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। খুন, গুম, ধর্ষণসহ নানা অপরাধ নিত্য-নৈমিত্তিক খবরের শিরোনাম হচ্ছে। কেন এই অবস্থা? অধঃপতন ঘটেছে আমাদের চরিত্রের; ধ্বংস হচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্ববোধও। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেমন নিরাপদ নয় আমাদের শিক্ষার্থীরা, তেমনি বাবা-চাচার কোলে নিরাপদ নয় সন্তানও। অন্ধকার যুগেও এ অবস্থা ছিল বলে মনে হয় না। অপরাধ করেও অপরাধীর কোনো অনুশোচনা নেই বরং হয়ে উঠছে আরও বেপরোয়া। আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান একেবারে তলালিতে ঠেকেছে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন যা এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীর নৈতিক মান উন্নয়নে জন্য এথিকস ক্লাব গঠন, সততার দোকানে ক্রয়-বিক্রয়, বিখ্যাত মনীষীর গল্প অধ্যয়ন করে নৈতিক চেতনা গ্রহণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ দুর্নীতিবিরোধী শপথমালা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

যে শিক্ষার মধ্যে পর্যাপ্ত নৈতিকতার অভাব থাকে সে শিক্ষা সমাজের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, খুন, গুম, সংঘর্ষসহ নানারকম সামাজিক অনাচার নির্মম নির্যাতনের কথা প্রায়শই শোনা যায়। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘৃণিত কর্মকাণ্ডকে দমন বা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রে নানারকম উদ্যোগ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তা আশানুরূপ কমছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নৈতিকতার বেশ অভাব। ধনসম্পদ, বিদ্যা তথা সামাজিক অবস্থান সবকিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবন যদি সুনীতি দ্বারা চালিত না হয়, তাহলে অনেক অশুভ ঘটনাই মানুষ ঘটাতে পারে। এমনকি আইন প্রয়োগ করেও নীতিভ্রষ্ট মানুষকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয় না। যে সমাজের সিংহভাগ মানুষের অন্তরে পর্যাপ্ত নৈতিক জ্ঞান অনুপস্থিত সেই সমাজে বৈষয়িক উন্নতি থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত শান্তি আসে না। নৈতিক চেতনা জাগ্রত না হলে মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ করতে পারে। আর পশুবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোনো কাজ করে তখন সেই সমাজকে নৈতিক সংকটপূর্ণ সমাজ বলা হয়। আমাদের দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, ক্রীড়া প্রভৃতি দিক থেকে প্রভুত অগ্রগতি লাভ করলেও নৈতিক দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না; বরং সমাজ দিন দিন নীতিহীনতার অন্ধ গলিতে নিপতিত হচ্ছে। এ সব থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো নীতিশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া। একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তির নৈতিকমান সুদৃঢ় হতে থাকে শৈশবকাল থেকেই। ফলে স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নীতিশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। একজন দর্শন অনুরাগী হিসেবে নীতিশিক্ষার ব্যবহারিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে নীতিশিক্ষা কীভাবে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতিতে ভূমিকা রাখে তা উদঘাটন জরুরী বলে প্রস্তাবিত গবেষণা কাজে হাত দিই এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব মূল্যায়নে সচেষ্ট হই, যা এ প্রবন্ধের তাৎপর্যকে অর্থবহ করেছে। নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক অবক্ষয়রোধে এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু?

তাছাড়া আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের বিশেষ অংশ হিসেবে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব মূল্যায়নেরও প্রয়াস রয়েছে এ প্রবন্ধে।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (synthetic method), বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (analytical method) ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বই, পুস্তক, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণী পদ্ধতি (analytical method)'র সাহায্যে বিশ্লেষণ করে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়াও, প্রবন্ধটিতে গুণগত (qualitative) পদ্ধতি অনুসরণেরও প্রয়াস রয়েছে।

১.৪. নীতিশিক্ষা ও সমাজজীবন

একটি সমাজের গঠন, প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ভর করে। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজ ছাড়া সে প্রকৃত জীবন-যাপন করতে পারে না। সমাজিক কর্মকাণ্ড ব্যতিত তার আচরণ মূল্যায়ন অর্থহীন। সমাজের বিধি-বিধানই তাকে সহজ-সরল নৈতিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের তিরস্কার সমাজেই করা হয়, কারণ মানুষ সমাজেরই অংশবিশেষ। সমাজ ছাড়া মানুষের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আচরণ যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি মানুষ ছাড়াও সমাজের কথা চিন্তা করা হবে অমূলক। তাই বলা যায়, নীতিশিক্ষা যেমন ব্যক্তির নৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করে তেমনি সমাজও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তির নৈতিক আদর্শ উন্নয়নে সহায়তা করে (Sidgwick ১০৫-১১১)। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিরোধ দেখা দেয় এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট জনসমষ্টি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো না কোনোভাবে বিরোধের মীমাংসা করে। এভাবে স্বার্থে সংঘাত ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক ইতিহাস বিকশিত হয়। এই প্রক্রিয়া কখনো শান্তিপূর্ণ আবার কখনো সংঘাতপূর্ণ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, নীতিশিক্ষা ব্যক্তির নৈতিকমান উন্নত করে সমাজের অনিষ্টকর কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সে ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে প্রকৃতি ও সমাজকে প্রভাবিত করে আত্মশক্তিকেও ইচ্ছানুযায়ী পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত করতে পারে। প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরে জাতিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিরোধ থাকে। সে বিরোধ মীমাংসা করে জাতিকে এগুতে হয়। যত ধীর গতিতেই হোক, জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিকযুগে মানুষের নৈতিক চেতনা সমানভাবে বিকশিত না হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ে নীতিশিক্ষার ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার মানুষকে প্রশান্তি এনে দিচ্ছে যা ভুলার নয়।

মানুষের চেতনায় আর একটি শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় বিবেক। বিবেক হলো মানুষের চেতনার অন্তর্গত সেই শক্তি যা মানুষকে তাড়িত করে অসত্য, অন্যায়, অকল্যাণ, অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা ও কুৎসিতের পথ পরিহার করে সত্য, ন্যায়, কল্যাণ, সম্প্রীতি ও সুন্দরের পথ ধরে চলতে শেখায়। বিবেক চালিত বিচারবোধই হলো নৈতিক চেতনা। বাস্তবের স্পর্শে আপন সত্তায় জাগ্রত প্রবৃত্তি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, ক্ষোভ, ক্রোধ, লোভ, ভয় ইত্যাদি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোনো কর্মে ধাবিত হয়, তখন সেই কর্মের ঔচিত্য-অনৈচিত্য, ভালো-মন্দ ফলাফল সম্পর্কে এবং উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত উপায় সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নের পর উত্তর, উত্তরের পর প্রশ্ন, আবার উত্তর, আবার প্রশ্ন..... এভাবে চলতে চলতে একসময় হয় এর মীমাংশা। এ ধরনের প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন ও উত্তর-প্রতিউত্তরই হলো যুক্তি। যুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনা

বিকশিত হতে পারে। ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত জীবনে নানা পরিস্থিতিতে নানাভাবে মানুষকে যুক্তি অবলম্বন করে চলতে হয়। বিশ্বে অপশক্তির জন্য যারা মূল দায়ী তারাও তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্তি অবলম্বন করে। সমাজে অপশক্তির যুক্তি ও শুভমুক্তির যুক্তি ভিন্ন প্রকৃতির। যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিদ্ধান্তে অটল থেকে মানুষকে কাজ করতে হয়। তবে মানুষ যখন বদ্ধ, অচল, অন্ধ, বিকাশহীন বিশ্বাসে স্থিত হয়, তখন সে তার বিবেক ও যুক্তিবোধকে সচেতন চেষ্টা দ্বারা বিশ্বাসের অনুকূলে একমুখী করে তোলে; স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; তার নৈতিক চেতনা বিকারপ্রাপ্ত হয়। ফলে, বিশ্বজগত বিকাশমান থাকলেও তার নৈতিক চেতনা বিকাশহীন বিশ্বাসে বন্দি থাকে। গঠনমূলক-দৃষ্টিভঙ্গিহীন, বিচার-বিবেচনাহীন মুক্তবুদ্ধির চর্চা (nihilist exercise of free thinking) দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হয় না। বরং, সার্বিক কল্যাণের জন্য যুক্তির পরিচায়ক হিসেবে নীতি-নৈতিকতার যথার্থ প্রয়োগ ও এর প্রয়োজন অপরিহার্যতায় রূপ নেয়।

নীতিশাস্ত্র কিছু স্বীকার্য সত্যের সন্ধান দিয়ে মানুষকে ন্যায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। এভাবে মানুষ ন্যায়, সুন্দর, শুভ, শ্রেয় ও কর্তব্য নির্ধারণ করে মীমাংসায় পৌঁছার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, দলীয়, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নীতিশিক্ষাকে যথাসম্ভব পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে; যুক্তির দ্বারা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে চিন্তা ও কাজ করার পদ্ধতিই হলো নৈতিক অনুশীলন (বেগম ১২-১৯)। ব্যক্তি জীবনের মতো সামষ্টিক জীবনেও নৈতিক অনুশীলন অপরিহার্য। ব্যক্তিগত সাফল্য, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আর্থ-সামাজিক- রাষ্ট্রীয় সকল কাজে নৈতিক অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। বিবেকবান মানুষ কোনো অন্ধ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা অন্যকে পরাজিত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য নীতি-নৈতিকতাকে ব্যবহার করে না, বরং সমাজে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রয়াসে ন্যায়, সুন্দর, শুভ কর্তব্য নির্ধারণ করা; প্রকৃষ্ট সাধন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং তা অবলম্বন করে কর্তব্য সম্পাদন করে। মানুষের জেগে ওঠা চেতনায় নীতি-নৈতিকতা নামক যে প্রবণতা প্রকাশ পায় তাই মানুষকে চালিত করে ন্যায়, সুন্দর, শুভ ও কর্তব্যের পথে। স্বাভাবিক অবস্থায় নীতিশিক্ষা ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, দলীয় প্রভৃতি সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াশীল থাকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যা নীতিশিক্ষা অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়।

১.৫. সমাজ, সংস্কৃতির উন্নয়নে নীতিশিক্ষা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সাথে নৈতিক উন্নয়ন আন্দোলনের বিষয়গুলোকে বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, উন্নত জাতিসমূহের নৈতিক চেতনা ও নৈতিক বাস্তবতা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত জাতির তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। অবক্ষয়ক্লিষ্ট সমাজে দুর্নীতির সমস্যা সমাধানের জন্য নৈতিক জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন উন্নত করার প্রয়োজন সর্বমহলে স্বীকৃত। আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উন্নত না করে কেবল দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা সমাজের সামগ্রিক কাঠামোয় কোনো উন্নতি আদৌ হবে না। আইনের পরিবর্তন দ্বারা ন্যায়বোধকে সমাজের সর্বান্তকরণে জোরদার করতে হবে, অন্যায়কে বর্জন করতে হবে অর্থাৎ অন্যায় বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও, অর্থনীতিবিদদের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল চিন্তায় নৈতিক উন্নয়নের বিষয়কে সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। শোষিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত মুক্তিকামী মানুষ যদি স্থায়ী সামাজিক উন্নতি অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সকল কাজের মর্মস্থলে নৈতিক অনুশীলন বাড়াতে হবে। নৈতিক জাগরণই পারে ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে কলুষমুক্ত করে সমাজে শান্তির সু বাতাস বইয়ে দিতে। তাছাড়া, রাষ্ট্রে প্রচলিত সামাজিক ব্যাধি থেকে গণমানুষকে

মুক্তি দিতে হলে যেমন দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দরকার তেমনি দরকার তা প্রণয়নের জন্য ও তা বাস্তবায়নের জন্য উন্নত নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ দক্ষ জনবল, যা কেবলমাত্র উন্নত নৈতিক অনুশীলনের দ্বারাই সম্ভব। এক্ষেত্রে, দেশের সরকার ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদদেরকে এগিয়ে আসতে হবে; রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনায় নীতি-নৈতিকতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক সকল কর্মকাণ্ডের মূলে জাগ্রত নৈতিক চেতনার উজ্জীবন ঘটাতে হবে।

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত (রায় ৬৯)। কিন্তু সে সময়কার সমাজব্যবস্থা বর্তমান সময়ের সমাজব্যবস্থার মতো এতটা উন্নত ছিল না। আদিম সমাজে মানুষ তার নিজের খেয়াল খুশি মতো চলতো; সম্পূর্ণভাবে তার নিজের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, কারণ সে সময়ে জীবনধারায় কোনো সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বা ধারণা গড়ে ওঠেনি। তবে এটা স্পষ্ট যে, একটি আদর্শ সমাজ কাঠামোর গভীরে যেমন সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ রীতিনীতি থাকা দরকার তেমনি দরকার পড়ে উন্নত নীতিবান জনসমষ্টি; যা শুধু নিজের জন্য নয় বরং উন্নত জাতি গঠনের জন্যও অপরিহার্য। সমাজের এমন সমষ্টিগতরূপই হলো ব্যক্তিমানুষের জীবনধারা গঠনের ও ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরির অন্যতম ক্ষেত্র। একথা সত্য যে, মানুষের সাংস্কৃতিক বিষয়াদি হলো মানুষের প্রতিনিয়ত শিক্ষার বিষয়। কারণ, সংস্কৃতির সাথে যুক্ত দিকগুলো হলো জ্ঞান, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন ইত্যাদি যা মানুষের দৈনন্দিন শিক্ষালাভের আওতাভুক্ত (ইসলাম ৬৩-৬৪; ১১১-১১৯)। এ বিষয়গুলো শিক্ষার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন তার নৈতিক চেতনার পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে, তেমনি উন্নত নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ জাতি গঠনের মাধ্যমে নিজ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতেও কার্যকর উদ্যোগ নেয়া সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

মানুষের সাংস্কৃতিক শিক্ষা, গঠন ও চর্চা পরিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় সমাজের আচার- আচরণের ভিত্তিতে তথা সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে। এই ভিত্তির ধরন, গঠন এবং শুদ্ধতার মাত্রাই নির্ধারণ করে কোন সমাজের সংস্কৃতি কেমন হবে, সমাজের প্রগতি ও উন্নতি কোন দিকে যাবে। তাছাড়া, সমাজে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক অবস্থানও ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নির্ধারণ করে। পরিণামে মানুষের জীবন, তার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সম্ভাবনা-বাস্তবতা সবই জোরালোভাবে নির্ভর করে সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নের উপর। এক্ষেত্রে, নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে অবজ্ঞা করে সামাজিক সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে জিয়িয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না, কারণ সম্ভাবনাগুলো সামাজিক প্রথা ও ধরনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সমাজের ঐতিহ্য এবং প্রথা হলো মানুষের আচরণ, অভ্যাস এবং চিন্তাধারার ভিত্তি- যার সূচনা শুরু করতে হয় শৈশব থেকেই (খালেক ৩-১১)। কাজেই বলা যায়, সমাজের ভিত্তি থেকে শুরু করে শৈশবকালের এবং কৈশোর ও যৌবনকালের শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিকে অর্জন করার এই যে বাস্তবতা তা অনস্বীকার্য। সমাজ যদি মানুষের সংস্কৃতির ভিত্তিমূল হয়, যে ভিত্তি থেকে মানুষ সাংস্কৃতিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে তাহলে সভ্যতার উন্নয়নসহ সমাজ, সংস্কৃতির উন্নয়নে নীতিশিক্ষার ভূমিকা গুরুত্ব বহন করে। সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ যখন সমাজের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় মিলিত হয় তখন সেখানে ঘটে চিন্তা, আবেগ, ভালো-মন্দ, সাফল্য এবং নানান দিক। উল্লেখ্য, ব্যক্তির এ বোধগুলো চালিত হয় মানুষের আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা। সংস্কৃতির এ দিকটিকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় মূল্যবোধের দিক। কিন্তু, মূল্যবোধভিত্তিক এ দিকের জন্য প্রয়োজন আবশ্যিক কিছু নীতিমালা ও বিধিমালা, যার মধ্য দিয়ে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং উচিত-অনুচিতের দিকগুলো সঠিক ভাবে ফুটে ওঠে। উল্লেখ্য, সংস্কৃতির এ নীতিভিত্তিক দিকের সাথে বিশ্বাসও যুক্ত থাকে। মানুষ শিক্ষার অধিকারে বিশ্বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে, গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করে, এভাবে জীবন ও জগতের নানা দিক দিয়ে নানান বিশ্বাস ধারণ করে। এভাবেই মানুষের সংস্কৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে

বহুমাত্রিকতায় (ইসলাম ১৭-২৯)। সমাজের এমন পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তি তার মেধা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সততা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়ে সে নিজেকে যেমন পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে তেমনি তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গোটা পরিবার, সমাজ এমনকি দেশেও উন্নয়নের জোয়ার ছড়িয়ে দিতে পারে।

১.৬. মানব প্রকৃতিতে নীতিশিক্ষার বাস্তবায়ন

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে তাকে সমাজবদ্ধভাবে সামাজিক বিধি-বিধান মেনে একত্রে বসবাস করতে হয়। ব্যক্তির এ বৈশিষ্ট্যের ফলে ব্যক্তি তার নিজের খামখেয়ালির পরিবর্তে অন্যের অধিকার ও কর্তব্য কাজের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নিজের সামাজিক মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সমাজে নৈতিকতা বাস্তবায়নের পথও সহজতর হয়। এটা সত্য যে, আমরা আমাদের কাজের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার করব কল্যাণমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। কল্যাণ চিন্তাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ করে যাব। কারণ, নীতিবিদ্যায় নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ। এখন প্রশ্ন হলো, কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ সমাজে বাস্তবায়নের উপায় কী? উত্তরে বলা যায়, সমাজে বসবাসকারী মানুষের নানা বৈচিত্র্য যেমন দেহ-মনের বৈচিত্র্য; শিক্ষা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, কামনা-বাসনার বৈচিত্র্য প্রভৃতি দিক দিয়ে মানব প্রকৃতিকে জোরালো করে তোলে। মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যের এই ভিত্তি থেকে সমাজেও গড়ে ওঠে নানা মাত্রিকতা। উল্লেখ্য, বৈচিত্র্যের এই ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই বর্তমান প্রজন্মের নিকট সমাজে যথার্থ ও সময়পোযোগী নৈতিক শিক্ষার ভিত মজবুত করা সম্ভব (সুলতানা ১৭-২৯)।

মানুষ কীভাবে কাজ করবে, কাজটির ভালো-মন্দের মূল্যায়ন কী হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে একজন মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর। একজন মানুষ বেশি কথা বলতে গিয়ে ভুল কথা বলে বেশি, যা ঐ ব্যক্তির মানব প্রকৃতির সাথে যুক্ত; ব্যক্তিটি প্রকৃতিগতভাবে এক্সট্রোভার্ট ধরনের এবং তার বুদ্ধির মাত্রা উঁচুস্তরের নয় অথবা ব্যক্তিটি ভুলকে ভালোবাসে। বাস্তবে এমন অনেক মানুষ আছে যারা ভুল পথে চলতে আনন্দ পায়, অন্যকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পায়। আবার এমনও অনেক মানুষ আছে যে সত্য বলে দুঃখকে মেনে নিবে, কিন্তু কখনোই মিথ্যা বলবে না। ভারতীয় চার্বাক দর্শনের আলোচনা ও চর্চা থেকে মনে হয় যে, এমন মানুষ আছে যারা ঋণ করে হলেও ঘি খাবার পক্ষে; কিন্তু বাস্তবে এমন মানুষও আছেন যারা অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটালেও খাবার কেনার জন্য ঋণ করবেন না। তাই বলা যায় এসব বিধিবদ্ধ বিষয়াদী ব্যক্তির জীবনদর্শন ও তার নিজ প্রকৃতির সাথে যুক্ত। সব মানুষ ও তাদের বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষ তার নিজ প্রকৃতি দিয়ে কাজ করে। এখানে মানবপ্রকৃতি বলতে মানুষের জীবতাত্ত্বিক দিকের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে, ব্যক্তির এ প্রকৃতিকে নৈতিক শিক্ষা বা আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করা সম্ভব (Dasgupta ১৭-২৯)। আর এ পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নৈতিকভাবে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর মধ্য দিয়েই সমাজে নৈতিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে যে দিকগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দিক হলো ব্যক্তির পারিবারিক শিক্ষা; এ শিক্ষাই ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে অধিক মানবিক হতে সাহায্য করে। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত যেসব দিক ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে, সমাজের সে

সব ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সঠিক পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার সঠিক

বাস্তবায়নের পথ সুপ্রশস্ত করতে পারে। মানুষ কী কাজ করে; কেমন কাজ করে; কাজটি করা উচিত কি-না এসব প্রশ্নের সাথে নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে যুক্ত (Dasgupta ৯-১৭)। দৈহিক শক্তি মানুষকে অনেক সময় খ্যাতি অর্জনে প্রেরণা যোগায় বটে, কিন্তু নৈতিক ভিত মজবুত না হলে ব্যক্তির সেই খ্যাতি স্থায়ী হয় না। এককথায়, খ্যাতির চেয়ে অপবাদই বেশি হয়। নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেহ-মনের সম্পর্ককে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, ব্যক্তির আচরণের দৈহিক প্রকাশ এবং গঠনের জন্য মানসিক দিককে নিয়ন্ত্রণ করে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। মানসিক দিকের নিয়ন্ত্রণ এবং গঠন মূলত শিক্ষার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা থাকবে মূখ্য, অথচ নৈতিক শিক্ষার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দেহ-মন উভয়েরই জোরালো ভূমিকা থাকবে এবং এটা হবে দেহ-মনের নিম্নপর্যায়ের গুণগত মান নিয়ে। যে ব্যক্তি জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দিয়ে চলবে বা যে ব্যক্তির মন সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ তারা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণে অনেকটাই উদাসীন থাকে। অথচ, আমাদের উচিত শিক্ষাকে গ্রহণ এবং ধারণ করা মন ও মননশীলতার মাধ্যমে। এদিক থেকে বলা যায় পরিবার, সমাজ এবং দেশে নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি এ শিক্ষাগ্রহণে ব্যক্তির ইতিবাচক মানসিকতার গুরুত্বকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মানুষ মন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেহকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারলে একদিকে মানুষের আচরণ যেমন সুন্দর, সঠিক ও ভালো হয়; অন্যদিকে তার কর্মকাণ্ডের প্রভাব সমাজ উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে (Foot ১৯-২১)।

মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে দার্শনিক প্লেটো দু'টি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো জীবতাত্ত্বিক দিক এবং অন্যটি হলো মননশীলতার দিক। প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজে যে শ্রেণি-বিভক্তির কথা বলেছেন, সেখানে ব্যক্তির আত্মার তিনটি দিকের উল্লেখ আছে; সেগুলো হলো-প্রবৃত্তি, বিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা। মানব প্রকৃতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি শিশুকালে জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি নিয়ে জীবন শুরু করে। এ সময়ে মানব জীবনের ভিত্তিমূলক মৌলিক শিক্ষার শুভ সূচনা হয়, যা শিশুকালে সূচিত না হলে জীবনে আর কখনোই তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। নৈতিক শিক্ষাও জীবনের ভিত্তিমূলক একটি মৌলিক শিক্ষা; এটা মৌলিক এ কারণে যে, এই শিক্ষার শূন্যতা জৈববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে পারে। এটা অনস্বীকার্য যে, নৈতিক শিক্ষার সূচনা শিশুকালে শুরু না হলে, পরবর্তীকালে সেটা যে আর কখনোই হয় না যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কথা বলতে শেখা (তরফদার ১৯-২৭)। শিশুকালে যে কথা বলতে শিখতে পারে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জীবনের কোনো স্তরেই সে আর কখনোই কথা বলতে পারে না, অর্থাৎ সে হয় বাকপ্রতিবন্ধী। আর একটি দৃষ্টান্ত হলো- শিশুকালে যে হাঁটা শিখতে পারেনি, সে-ও হয় এক ধরনের দৈহিক প্রতিবন্ধী। স্বাভাবিক হাঁটা-চলা করা কখনোই তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুক্তির ধারাবাহিকতায় এ কথা বলা যায় যে, শিশুকালে যে স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা পায় না, প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তার সেই শিক্ষা গ্রহণ আর কখনোই হয়ে ওঠে না। কাজেই, আদব-কায়দা, রুচি-সংস্কৃতি, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দেরবোধ এগুলোও এক ধরনের মৌলিক শিক্ষা যা শিশুকালেই আরম্ভ করতে হয় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা আরও অধিক পরিপক্ক হয়ে ওঠে। শিশুকালে যাকে চেষ্টা করেও আদব-কায়দা, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-নৈতিকতা শেখানো যায় না, প্রকৃতিগতভাবেই সে হয় আদব-কায়দা বর্জিত, নীতিবিমুখ একজন মানুষ; যে পরিবার, সমাজ, জাতি তথা দেশের কোনো উপকারেই আসে না বরং এরা জাতির জন্য হয়ে ওঠে বোঝাস্বরূপ।

সমাজের এমন ব্যতিক্রমী কিন্তু স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির কথা না বলে যদি সমাজের বৃহত্তর শ্রেণির কথা বলি, তাহলে বলব যে, তাদের জীবন পরিপূর্ণভাবেই নির্ধারিত হয় সমাজ, সমাজের প্রথা, বিধিমালা, সমাজে প্রচলিত রীতি-

নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি দিয়ে। এমন বাস্তবতায় সমাজের সকল সাধারণ মানুষই বাস করে প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদির সংস্পর্শে যার মধ্য থেকে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নৈতিক বিধি-বিধান আয়ত্ত্ব করে। একইভাবে ধর্মীয় গণ্ডি, রাজনৈতিক গণ্ডি, প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডি প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মানুষ বসবাস করে এবং সে মূল্যবোধের শিক্ষা নিয়ে থাকে, যা তাকে ন্যায়বান হতে সহায়তা করে (বটোমোর ৯৯-১০৭)। সমাজের প্রতিটি মানুষই এমন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অধিকারী; স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষ ব্যতিত অধিকাংশ মানুষই বাস করে সংকট ও সমস্যার অন্তহীন পরম্পরার হতাশা নিয়ে। এতদসত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তির জীবনে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একাডেমিক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা চলে না। তাইতো এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ শিশুকালে শুরু হলেও এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয় যৌবনকাল অর্থাৎ একাডেমিক পরিসরে।

১.৭. ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি শিক্ষা: প্রসঙ্গ জন ডিউই

শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জন ডিউই বলেন, শিক্ষার লক্ষ্যের একটি অংশ হলো মূল্যবোধ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটি সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্ব এবং সমাজস্থ মানুষের উন্নতি, প্রগতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সমাজের মূল্যবোধ কাঠামোর উপর। এই মূল্যবোধ কী প্রকারের এবং তা ভালো কী মন্দ তা বড় কথা নয়, বরং বড় কথা হলো সেই মূল্যবোধের কাঠামোটি কতটা সুদৃঢ় ও সুসংহত। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে শিক্ষা কাঠামোর তাত্ত্বিক ভিত্তির ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়ন দ্বারাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব বলে ডিউই মনে করেন। নীতিশিক্ষা কেবলমাত্র মসজিদ, মন্দির, চার্চ, প্যাগোডা অর্থাৎ শুধুমাত্র উপাসনালয়ের বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ (দাশ ১৯-২৩)। অর্থাৎ, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের সমন্বিত অংশ হিসেবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সম্ভব। মূল্যবোধের সাধারণ ধারণার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু মূল্যবোধ রয়েছে যার আবেদন, প্রয়োজন ও ভূমিকা সকল সমাজে সমানভাবে স্বীকৃত। এগুলোকে শাশ্বত মূল্যবোধও বলা হয়। এগুলো শাশ্বত এ জন্য যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন-যাপনের মৌলিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক কার্যাবলী এ মূল্যবোধগুলির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সকল সমাজের মানুষ এ সত্যটি উপলব্ধি করছে যে, তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সমাজিকও রাষ্ট্রীয় জীবনকে অধিক সুন্দর ও অর্থবহ করার জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী আচরণ ও কর্ম করা আবশ্যক। ব্যক্তির এ মূল্যবোধগুলির মধ্যে অন্যতম হলো- সত্যবাদিতা, সততা, সৌন্দর্যবোধ, কৃতজ্ঞতা, দয়া ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল যুগে সকল সমাজে এ মূল্যবোধগুলিকে মানবজীবনের নীতি-নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, আরও অনেকগুলো মূল্যবোধের উল্লেখ করা যায় যেগুলো শাশ্বত মূল্যবোধের মতো স্থায়ী না হলেও উন্নত জীবন যাপনের সাথে তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক আদর্শ, সমাজচেতনা, জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ ইত্যাদি যা উন্নত নৈতিক চেতনা গঠনের মাধ্যমে সম্ভব (দাশ ৫৯)। সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধগুলোর অনুশীলন এবং ব্যবহারিক ও কর্মজীবনে সেগুলির যথাযথ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে একটি সমাজের সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নতি। এজন্য, নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মূল্যবোধের শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা সকল মহলেই সমানভাবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য, এ শিক্ষা শুরু করা প্রয়োজন প্রাথমিক স্তর থেকেই; কেননা এ স্তরই একজন শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ আহরণের এবং গঠনের উপযুক্ত সময়, কেননা

এ সময়ই শিশুর মন থাকে সাদা কাগজের মতো। আর এই উপযোগী মানসিক সংগঠন বা মনোভাব শিক্ষার্থীর সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মূল্যবোধের শিক্ষাই যে কেবলমাত্র মূল্যবোধের সংকট নিরসনের জন্য একমাত্র উপায় তা-ই নয় বরং একাডেমিক শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও একেবারে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, তাই বলে এ সংকট নিরসনে শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে না তা বলা অনুচিত। বর্তমান সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধের সংকট দূর করতে হলে শিক্ষাকে সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে যুগোপযোগী করতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা যায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। মানুষের জীবনের মূল্যবোধগুলি যদি সমাজে বিদ্যমান সমস্যার অনুরূপ হয়, তাহলে সমাজজীবন ও মূল্যবোধগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। এ জন্য উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদেরকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল করে তোলা সম্ভব। অর্থাৎ, শিক্ষায় আবশ্যিকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে (রবীন্দ্র রচনাবলী ৭০০-৭০৭)। এসকল কাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকাকেও বিবেচনায় নিতে হবে। শিক্ষককে সমাজে বিবেচনা করা হয় সমাজের নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে। কাজেই, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে মূল্যবোধের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বড় সংকট হলো অধিকাংশ শিক্ষার্থী তথা যুব সমাজের মধ্যে স্থায়ী ও অনুসরণযোগ্য আদর্শের বড়ই অভাব। অথচ, জাতীয় জীবনে জাতীয় ঐক্যের সংকটের কারণে জাতীয় আদর্শের এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত মডেল নেই যাকে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে। রাষ্ট্রের এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বড় প্রয়োজন এমন আদর্শ যাকে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করবে, যাদের প্রেরণায় নতুন প্রজন্ম গঠন করবে বাসযোগ্য একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে সাধারণের কর্মকাণ্ডে, জীবন-জীবিকায় ন্যায়, সততা, ধর্মপরায়ণতা, অহিংসা, দৃঢ়চেতা, সাহস, সেবা করার মনোভাব, মানবকল্যাণ প্রভৃতি সৎ গুণাবলি শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এভাবে এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ শিখার সঠিক বুনিয়াদ রচনা করতে পারে।

জন ডিউই বলেন, শিশুকালে নৈতিক শিক্ষার শুরু হবে একজন শিশুর আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে এবং ধীরে ধীরে উচ্চতর শিক্ষার মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে (Dewey ৩৩-৩৪)। আচরণ এবং ব্যক্তিত্বের গঠন যেমন শিশুকাল থেকে শুরু হয়, একইভাবে আচরণের ও ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধের দিকটির গঠনও শিশুকাল থেকে শুরু হয়। জন ডিউই-এর শিক্ষা ভাবনা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তাঁর এ নীতি এতটাই বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিল যে তিনি তুরস্ক, রাশিয়া, চীন এবং জাপানে শিক্ষার সংস্কারমূলক কাজে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তিই হলো শিক্ষা (ওয়াহাব ১১১-১১৯) ; তবে এ শিক্ষা হতে হবে আধুনিক, যুগোপযোগী ও নীতিভিত্তিক; যাতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান দেশ মাতৃকার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ভালো সমাজ গঠনের জন্য মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রয়োজন হয়, তা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব। শিশুকালে যদি আমরা শিশুদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে পরবর্তী জীবনে তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সঠিক নীতি ও আদর্শ প্রয়োগ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে পারবে, এভাবে তাদের পুরো জীবনই গড়ে উঠবে নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে। মনোবিজ্ঞানের চিরায়ত সাপেক্ষীকরণতত্ত্ব বা ক্ল্যাসিক্যাল কন্ডিশনিংতত্ত্ব অনুযায়ী যদি নৈতিকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নীতিশিক্ষা গ্রহণের জন্য কন্ডিশন করে দেয়া যায়, তাহলে সেটাই হবে তাদের দেহ-মন গঠন এবং ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ

ক্ষেত্র। নৈতিক সাপেক্ষীকরণ তখন চলবে চিরায়তভাবে। *'রিপাবলিক'* গ্রন্থে প্লেটো যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন, সেখানেও এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থায় ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্নে মতপার্থক্য ও বিতর্কের অন্তহীন সুযোগ থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অন্যায় ও অ-বিবেচনা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও অন্যায় ও অ-বিবেচনা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করছে। কোথাও মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্র চোখে পড়লেও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে পুরোপুরি নীতিশিক্ষার চর্চা করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। তাইতো বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে উৎকৃষ্ট জীবনযাত্রার জন্য মানবজাতির নৈতিক চেতনার জাগরণ আজ সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে দরকার বিশ্বব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার আইন-কানুন, রীতিনীতি, প্রথা ও পদ্ধতির বিস্তৃত উন্নয়ন। উন্নত আর্থিক জীবনের সাথে চাই উন্নত মানসিক জীবনব্যবস্থা, যা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায়, নৈতিক অনুশীলনে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে সংগঠিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন পড়ে (হক ৯)। চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে বিকাশমান সুস্থ নৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে ন্যায়স্বার্থ ও হীনস্বার্থের পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ করে এবং বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ন্যায়ের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। কেবল নিজের সুখ নয়, বরং সকলকে নিয়েই সুখী হতে হয়, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়- উপযোগবাদীদের এ নীতিও সঠিক এবং তা আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এটা সত্য যে, সার্বজনীন কল্যাণের মধ্যেই নিহিত থাকে ব্যক্তিগত কল্যাণের যাবতীয় আদর্শ। মানুষের কল্যাণের জন্য আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন ফ্রয়েড়, এডলার প্রমুখ। এঁরা মানুষের স্বরূপ ও চেতনার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। মহাত্ম্য গান্ধী মানুষকে মহৎ সব সম্ভাবনার আকার হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, অহিংসার দর্শন অবলম্বন করে মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীকে শান্তির আবাসস্থলে উন্নীত করার সামর্থ্য রাখে। কারণ, মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মে না, বরং মনুষ্যত্ব নামক গুণটি সে অর্জন করে। মানুষ ধর্ম কিংবা যুক্তি নিয়ে জন্মে না, জৈবিক সামর্থ্য কিংবা এর অন্তর্গত সম্ভাবনা অবলম্বন করে ধর্ম, আদর্শ, যুক্তি তাকে অর্জন করতে হয়। মানুষকে মানুষ হতে হয় মানবিকীকরণের মধ্য দিয়ে, মনুষ্যত্ব অর্জন করে। এই অর্জনে মানুষের অন্তর্গত ইচ্ছাশক্তির, চিন্তাশক্তির, শ্রমশক্তির এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উন্নত জীবন, উন্নত সমাজ, উন্নত রাষ্ট্র ও উন্নত বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে তার ভিত্তিভূমি হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য (Brubachr ২২১-২২৯)।

১.৮. নীতিশিক্ষা অর্জনের বাস্তব ক্ষেত্রসমূহ

ব্যবহারিক জীবনে অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় নীতিশিক্ষা গ্রহণেরও বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে (বিশ্বকোষ, খন্ড-৩, ৭, ১১-১৯; ১১৩-১১৯)। এ শিক্ষা মূলত স্কুল পর্যায় থেকেই শুরু হয় এবং তা জীবনব্যাপি চলমান থাকে। শিশুকাল থেকেই এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে গ্রথিত করা প্রয়োজন। যদিও প্রতিটি শিশুই প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই অনানুষ্ঠানিকভাবে এ শিক্ষা লাভ করে। স্কুল পর্যায় থেকে তাদের মধ্যে নৈতিক সত্য ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়টি অধিক জাগ্রত করা প্রয়োজন। শিশুদের নৈতিক নিয়মাবলি ও মূলনীতি সম্পর্কে সচেতন করা উচিত। যাতে তারা আচরণের যৌক্তিকতা বুঝতে সমর্থ হয়। নৈতিক মূল্যবোধ শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য কিছু ব্যবহারিক অনুশীলনও শিক্ষাক্রমের সাথে যুক্ত করা উচিত। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে সদাচার ও শিষ্টাচার শেখার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের প্রতি সহমর্মিতা; কনিষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ, অসুস্থ, অনাথ ও পীড়িত মানুষের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব জাগ্রত করা নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন

শিক্ষা দেয়া ও তা গ্রহণ আমাদের একান্ত কর্তব্য কারণ এটি আমাদের আদর্শিক করতে প্রেরণা যোগায়। একটি শিশু জন্মের পর পরিবারের মধ্যে বেড়ে ওঠে। পরিবারই হচ্ছে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। পারিবারিক শিক্ষার ত্রুটি শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের ভুলের কারণ হতে পারে। তাছাড়া, শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল বিকাশ সম্ভব নয়; এমনকি পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করাও হয় দুরূহ। ফলে, মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অন্তরে নৈতিক শিক্ষার জাগরণ ঘটানো (বিশ্বকোষ, খণ্ড-৪, ৬৯-৭৭)।

গবেষণার এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর অন্তরে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কতিপয় ধাপ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১.৮.১. প্রাথমিক পর্যায়: দেশের সকল শ্রেণির মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও তার সাফল্য নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর। কাজেই, এ পর্যায়ের শিক্ষার ভিত্তিভূমিকে দূর্বল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। এ স্তরের শিক্ষা শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে শিশুর মনে কর্তব্যবোধ, সদাচার, ন্যায় ও নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলির পরিস্ফুটন ঘটায়। অথচ, এ স্তরে জীবনকেন্দ্রিক বাস্তবমুখী শিক্ষাসূচির অভাবে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, উদ্যোগী শিক্ষকের অপ্রতুলতায় শিক্ষার বাস্তব ও কর্মমুখী উদ্দেশ্য এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সামাজিক চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সংগতি রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ব্যাপক পূনর্বিন্যাস করা দরকার। এ বিন্যাস একদিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল করবে, অন্যদিকে দেশের অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রযোজনীয়তা অনুধাবনে আমাদের বিশেষজ্ঞ মহলকে অধিক উদ্যোগী করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এভাবে সমাজে নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম হবে।

১.৮.২. মাধ্যমিক পর্যায়: শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের শিক্ষা। এ স্তরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা; সৎ, প্রগতিশীল ও নীতিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা; যাতে তারা সততা ও নৈতিকতা দ্বারা উচ্চ শিক্ষার্জনের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের নাগরিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সাথে সাথে তাদের জাতীয় সেবামূলক কর্মে অংশগ্রহণের জন্যও প্রেরণা দিতে হবে। এতে তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ যে বৃদ্ধি পাবে শুধু তাই নয়, বরং দেশের বর্তমান অবস্থায় সেবামূলক কর্মে ছাত্র সমাজের মতো একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে রাষ্ট্রীয় অনেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর হবে। একটি শোষণমুক্ত, শ্রেণিহীন, সৎ ও মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণি-বৈষম্য দূর করে শিক্ষার সকল পর্যায়ে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে। এ অর্থে বলা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা, নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধচারণ করে শিক্ষার্থীদেরকে এসব মানসিকতার পরিবর্তে কর্মপোযোগী, সৎ ও নীতিবান হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এ স্তরের শিক্ষাঙ্গনে কিংবা সমমান সুবিধাপূর্ণ শিক্ষায়তনে সকল শিক্ষার্থীর নৈতিক মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

১.৮.৩. উচ্চতরশিক্ষা পর্যায়: উচ্চশিক্ষার সব পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীর অধিক সংযোগ বাড়াতে হবে এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ এবং মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনে অধিক ফলপ্রসু ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধর্ম পালনে বা মত প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পাবার যে শিক্ষা তা আমরা মূলত এ স্তরের শিক্ষা থেকে পেয়ে থাকি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক কর্মসূচি প্রণয়নে দেশের মৌলিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে নীতিশিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সক্রিয় বিবেচনায় নিবেন। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যে শিক্ষা মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এবং মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করতে সাহায্য করে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা মানুষের রুচিকে উন্নত ও মনকে শাস্ত্রানুগত্য ও কলুষমুক্ত করতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করে নৈতিক ও মানবিক উৎকর্ষের বিকাশ ঘটে এ স্তরের শিক্ষায়। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সমাজকে দিচ্ছে বিবেকবান মানুষ এবং দেশ উন্নয়নের সহযোগী, সার্থক, নিবেদিত ও বিশ্বস্ত কর্মচারী। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ রক্ষণশীলতার ঘাঁটি হিসেবে নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে দেশ ও জাতির সেবায় কাজ করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, এটাই সমাজের প্রত্যাশা।

১.৯. নীতিশিক্ষা বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

নৈতিক কর্মকাণ্ড যখন সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তখন তা সামাজিক নীতিমালায় পরিণত হয়। কিন্তু, সব সামাজিক নীতিমালা নৈতিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে না। যেমন- যে সমাজ সতীদাহ প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সে সমাজ নৈতিক অনুশাসন বা বিবেকের রায় মেনে চলেনি। কারণ, এসব কর্মকাণ্ডে মানব প্রাণের স্বতঃমূল্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে, যা নৈতিকতার অপরিহার্য মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। সম্পূর্ণ নৈতিক ও মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই রাজা রামমোহন রায় এ রকম সামাজিক কু- প্রথার বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ান। এটাই 'না' বলতে পারার নৈতিক শক্তি যা অভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা বিবেক থেকে জাগরিত। এই প্রেরণা থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কাজেই, প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা তাই যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানবিক করে তোলে। নীতিবিদ্যায় প্রথমত কোনো কাজের যৌক্তিকতার ধারণা দেয়া হয়, যাতে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শেখে কেন এটি কর্তব্য কাজ। এ শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা নৈতিক কর্তব্যটি সহজে গ্রহণ করার পক্ষে যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে পায়। কাজেই, একজন শিক্ষার্থীকে নীতিশিক্ষার তিনটি ধাপ অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় (খালেকুজ্জামান ৪৭-৪৮)। যথা-

প্রথমত- তাকে অবশ্যই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে সে ঔচিত্য ও অনৈচিত্য, ভালো-মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে;

দ্বিতীয়ত- শিক্ষার্থীকে কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে যাতে সে বুঝতে সক্ষম হয় কেনো এবং কোন বিশেষ আচরণটি তাকে আয়ত্ত্ব করতে হবে; এবং

তৃতীয়ত- তাকে সাধারণ কাজ ও নৈতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য শেখাতে হবে, যাতে সে শুধুমাত্র শাস্তির ভয়ে নয় বরং নৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই যথার্থ নৈতিক কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

উল্লেখ্য, আমার বিশ্লেষণে মনে হয়, নীতিশিক্ষার মূল তাৎপর্য তৃতীয় ধাপের মধ্যে নিহিত। এজন্যই এরিস্টটল বলেছিলেন (করিম ১১১-১১৭), মানুষ আইনের ভয়ে যা করে, দর্শন আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পালন করতে শিখিয়েছে। এখন প্রশ্ন: এ স্বতস্ফূর্ত নৈতিক জ্ঞান ব্যক্তি কীভাবে অর্জন করবে? বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা কারিকুলামে নীতিশাস্ত্র বলে আলাদা কোনো বিষয় নেই। যদিও, কখনো কখনো এটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে অপরিহার্যভাবে সম্পৃক্ত থাকে। বিশেষ করে, ধর্ম শিক্ষার সাথে তা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে বলা যায়, অংকশাস্ত্র বা ভূগোলের তুলনায় ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিকতার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। ধর্ম ও নৈতিকতার প্রকৃত সম্পর্কটি এভাবে নিহিত যে, উভয় শাস্ত্রেই অন্ধ কূসংস্কারের পরিবর্তে মুক্ত যুক্তিতর্কের সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষা দার্শনিকগণ বলেন যে, ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়ই কোনো না কোনোভাবে শিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁদের দাবি হলো, ধর্ম শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে; কারণ, ধর্মীয় বিধিবদ্ধ রীতি- নীতি ছাড়া নৈতিকতা অর্জন অসম্ভব। এখানে ধর্ম ও নৈতিকতাকে এমনভাবে সম্পর্কিত করা হয় যে, কেউ যদি সত্যিকার ধার্মিক হয়, তবেই সে নৈতিক হতে পারবে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকাংশই গ্রহণ করে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিকতা উভয়ই সত্য, সুন্দর, বাস্তবতা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি ও রাজনীতির বিভিন্ন তত্ত্বের মতো ধর্ম ও নৈতিকতার বিভিন্ন তত্ত্বও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষায় নৈতিকতার এ প্রায়োগিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এটিকে বেছে নিয়েছি। কেউ কেউ ধর্মকে বৃহত্তর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, কেউ আবার অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মকে গ্রহণ করে। সবার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই তা হলো যা কিছু সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণকর তা গ্রহণ করার মানসিকতা নিজের মধ্যে আয়ত্ত্ব করা এবং অন্যকে তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন যেহেতু আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তাই শিশুকালে এটা শুরু হবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং বয়োঃসন্ধিকালে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি থাকবে নৈতিক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন ও মননশীলতার পরিশুদ্ধি ঘটে। ব্যক্তির দৈহিক আচরণের গঠন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানসিক বিকাশপ্রাপ্ত হয় (*এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*, খন্ড-৭, ১১; ১৯, ২৭)। এভাবেই, মানব প্রকৃতির জীবতাত্ত্বিক দিক ও মানবিক (যা মননশীলতার ও মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশ) দিক নৈতিকভাবে বেড়ে ওঠে। এ স্তরে শৃঙ্খলা, সংযম, শিষ্টাচার, অধ্যবসায় ও সততা প্রাধান্য পায়। যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয় কিংবা অর্থ সংকটের কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না তাদেরকে কীভাবে উঁচু নীতিবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় তা-ও সংশ্লিষ্ট মহলের বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রয়েছে বটে, কিন্তু সেখানেও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে সার্টিফিকেটধারী উচ্চ শিক্ষিতের হার বেড়েছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার কমেছে আশংকাজনক হারে। যেসকল মেধাবী তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য বি.সি.এস. পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসন, পুলিশ, কাষ্টমস ইত্যাদি ক্যাডারে চাকুরী পাওয়া-যা তারা সোনার হরিণ মনে করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও অধিক ভর্তি হয় পড়ালেখা করে একটি ভালো চাকুরীর জন্য; ফলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শিক্ষার প্রতিও তাদের আগ্রহ কম। এতে তারা না শেখে নিজের পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুসমূহ, না শেখে মানবিক আচরণসমূহ (ওয়াহাব ২১-৩৯)। যে শিক্ষা মানুষকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে শেখায় না, মুক্তচিন্তার প্রেরণা

দেয় না, সে শিক্ষা মানুষের মানবিক বিকাশে কোনো কাজে আসে না। এজন্য বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, আমাদের উচিত মানবতা অর্জনের জন্য জ্ঞান, আবেগ ও ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করে মানবিক আচরণ করতে উৎসাহী হয় এবং মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে ব্রতী হয়।

১.১০ উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নীতিশিক্ষা মানব আচরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবতাবোধ জাগরণের এক মহানিয়ামক হিসেবে কাজ করে। মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নৈতিকতা ও মানবতাবোধ জাগ্রত হওয়া এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রায়োগিক দিক। উল্লেখ্য, নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এবং তা শেষ হয় কর্মজীবনে। তাছাড়া, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সে সব শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা তার মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পেশাগত মনোভাব তা বাস্তবায়নের পথকে সুগম করে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। এটা সত্য যে, অনেক সময় চিকিৎসা নিয়েও আমরা সুস্থ হতে পারি না, ঔষধ সেবন করেও সব সময় সব রোগ নিরাময় হয় না। কিন্তু, তাই বলে চিকিৎসা গ্রহণ বা ঔষধের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হবে অমূলক। একইভাবে নৈতিক শিক্ষা হয়তো কখনো কোনো প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে, একজন ব্যক্তিকে নীতিবান করার ক্ষেত্রে বিফল হলেও এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাকে বাস্তবিক অর্থে অস্বীকার করা যাবে না। তাছাড়া একটি রাষ্ট্রের সকল সেক্টরকে দূর্নীতিমুক্ত করত: সর্বত্র নৈতিকতার অনুশীলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আমরা পারিবারিকভাবে এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে যতই নৈতিকশিক্ষা গ্রহণ করি না কেন, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ঘটাতে না পারলে নৈতিক সমাজ গঠন করা হবে অসম্ভব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সকলস্তরে নীতি-নৈতিকতার অনুশীলন একান্তই প্রয়োজন। তবে এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদেরকে এ ব্যাপারে অধিক যত্নবান হওয়া এবং সর্বত্র সফলভাবে আইনের প্রয়োগ ঘটানো। একজন মানুষ দেহ ও মনের দিক থেকে যতই নৈতিকতাসম্পন্ন হোক না কেন দৈনন্দিন বাস্তব কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি সেক্টর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে দূর্নীতিমুক্ত না হয় তবে কখনোই নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রের সর্বত্র শক্তিশালী গণতন্ত্রের চর্চা আমাদের এ সংকট উত্তরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কাজেই, এক্ষেত্রে বলা যায় যে, নৈতিকতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনীতির ভূমিকাও একেবারে নগণ্য নয়, কারণ রাজনীতি ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর, একটি সমাজের গঠন, প্রকৃতি ও স্বরূপের উপরই নির্ভর করে কোন সমাজের নৈতিক মানদণ্ড কেমন হবে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ধারা হবে গণতান্ত্রিক; আর গণতন্ত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকাকে খাটো করে দেখা সমীচীন নয়।

তথ্যসূত্র

রহমান, আবু তাহা হাফিজুর। *ধর্ম ও নৈতিকতা*। স্মারক সংকলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা, ১৯৭৯।

Sidgwick, Henry. *Outline of the History of Ethics*. London: MaCmillan Co. & Ltd., 1954।

বেগম, হাসনা (অনুদিত) । *নীতিবিদ্যার মূলনীতি*। বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

রায়, আন্নদাশংকর। *আধুনিকতা*। ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৫৩।

ইসলাম, আমিনুল। *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*। মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২।

খালেক, এ.এস.এম. আবদুল। *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*। অনন্যা প্রকাশন, ২০০৩।

সুলতানা, আয়েশা। *বাংলাদেশে নারী সমাজ ও নৈতিক সংকট*। স্মারক সংকলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা: ১৯৮৫।

Dasgupta, S.N. *Obscure Religions Cults*. Calcutta: Firma K.L.M. Ltd. 1946।

Foot, Philippa (ed.). *Theories of Ethics*. London: Oxford University Press, 1968।

তরফদার, মমতাজুর রহমান। *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা*। বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

বটোমোর, টম. (অনুবাদক-হিমাচল চক্রবর্তী) । *সমাজবিদ্যা, তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা*। সাফা পাবলিকেশন্স, ২০০১।

দাশ, সত্যনারায়ন। *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪।

রবীন্দ্র রচনাবলী। *লক্ষ্য ও শিক্ষা*। বিশ্বভারতী, ১৩৯৮।

Dewey, John. *Philosophy of Education.* New York: Pappya, 1959।

ওয়াহাব, শেখ আবদুল। *কান্টের নীতিদর্শন*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮২।

হক, আবুল কাশেম ফজলুল। *জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু জরুরী বিবেচ্য*। গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৭।

Brubachr, John S. *Modern Philosophy of Education.* New York: MaCgrow Hill Book Company, 1950।

দর্শন বিশ্বকোষ। খণ্ড-৩, ৪, ৭,।

খালেকুজ্জামান। *শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে*। শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, সমাজচিন্তা ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা, ২০০১।

করিম, সরদার ফজলুল। *দর্শন কোষ*। বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। খণ্ড-৭, ১১।